-আমিও তো উনার সাম্রাজ্যেই বসবাস করি।

- না না এটা রেলের জায়গা। উনার জুরিসডিকশনের বাইরে। শুধু ল এন অর্ডারের প্রবলেম বলে আমি এখানে

-যাক বাবা বাঁচা গেল।

-মানে

-না না কিছু না। আসুন। হ্যাভ এ সিট।

হ্যাভ ব্রেকফাস্ট উইদ মি।

-আজ কিন্তু আপনাকে বেশ কার্টিয়াস মনে হচ্ছে। আমি তো ভেবেছিলাম আপনি ইউরোপ থেকে অসভ্য হয়ে ফিরেছেন।

বলেই জিভ কাটে সুরাইয়া। প্রিন্সিপ্যালকে

অসভ্য বলাটা কী ঠিক হলো।

-রিয়া অবশ্য বলেছে য়্যুনিভার্সিটিতেও

আপনার কার্টিসির অভাব ছিল।

সাজিদের সমালোচনা শুনতে ভালোই লাগে। রোবনাথ বলেছেন আত্মসমালোচনা করতে শেখ। পিয়ন জলিল মিয়া পান খাওয়া দাঁত বের করে লুঙ্গি পরে দাঁড়িয়ে। খানিকটা বিব্রত। কারণ হোস্টেলে গন্ডগোলের কারণে কস্টিউমে গন্ডগোল হয়েছে। পাতলুন পরার সময় পায়নি। আর ভাবতেও পারেনি ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাডাম কোত্থেকে এসে হাজির হবে।

-আমি বহুত শর্মিন্দা ম্যাডাম

গোস্তাকী মাফ করবেন।

আরে এতো হুবহু সেই সুবে বাংলার কাহিনীধর্মী বাংলা ছবির ডায়ালগ। তবে ম্যাডামের জায়গায় হুজুরাইন হবে। যাই হোক জলিল মিয়ার শিষ্টাচার প্রশিক্ষণ হয়েছিল ইসলামিক স্টাডিজের শিক্ষক ইরফান সাহেবের কাছে। সে কারণেই হয়তো এইসব সুবে বাংলার জারগন ঢুকে পড়েছে। জলিল মিয়ার বিগলিত হাসিতে সুরাইয়া খানিকটা অস্বস্তিতে পড়ে। এই মুহূর্তে জলিল মিয়া আত্মবিশ্বাসী। কারণ প্রিন্সিপাল সাহেবের কস্টিউমও ঠিক নাই। গুঞ্জি পরে অফিসে আসছে। টি শার্টকে এতদঞ্চলে আদর করে গুঞ্জিই বলা হয়।

-ম্যাডাম কী খাইবেন।

জলিল মিয়া এমনভাবে বলে যেন সে হোটেল হিলটনের ব্রেকফার্স্ট রুমের অ্যাটেনডেন্ট। সুরাইয়া সাজিদের দিকে তাকায়।

সাজিদ অর্ডার দেয়

তেলছাড়া পরোটা, সবজি

আর রসগোল্লা।

সাজিদ সুরাইয়ার দিকে তাকিয়ে বলে,

পাঁচফোড়ন দেয়া ভেজিটেবল

হিন্দুদের বাড়ির প্রিপারেশন।

মারাত্মক খেতে। ইউ মাস্ট লাইক ইট।

সুরাইয়া অবাক হয়ে তাকায়। ও ভাবতেই পারেনি হোস্টেল দখলের কেস তদারকি করতে এসে এমন চমৎকার একটা সকাল রচিত হবে। সাজিদ জলিলের দিকে তাকায়। সে অদৃশ্য সাবানে হাত কচলাচ্ছে।

- কি যাও

-যাচ্ছি সার।

ফাসু কোথায় হাওয়া হলো কে জানে। নিশ্চয়ই ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কবিরুন একটা ভস্মীকরনসুলভ লুক দিয়েছে। অমনি মেনিমুখো ফাসু মেনিমুখো মিনসের মতো হেঁসেল ঘরে ঢুকেছে। অর্থাৎ স্টাফ রুম। ভাইসপ্রিন্সিপ্যালের রুমটায় কাজ চলছে বলে এখন ফাসু স্টাফ রুমে অন্য শিক্ষকদের ব্রেন মাসালা তৈরি করে। তাই আপাতত সেটাকে হেঁসেলঘর বলাটাই সমীচীন। ধড় মড় করে ইরফান এসে ঢুকে প্রিন্সিপ্যালের ঘরে। ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাডামকে দেখে জড়োসড়ো হয়ে যায়। কিন্তু প্রিন্সিপাল বয়সে ছোট বলে সম্মান দেখাতে বাধে। তবুও আমতা আমতা করে। দশটার মিটিং এ সে থাকতে চায়।

ইরফান মাদ্রাসার ছাত্র ছিল। হাইড্রোসিলের কারণে আর্মিতে ঢুকতে পারেনি। ঢাকার জগা বাবুর পাঠশালা থেকে ইসলামিক স্টাডিজে তৃতীয় শ্রেণী লাভ করতঃ এখন পাকশীতে দান্তের ডিভাইন কমেডির গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্র। মাদ্রাসা ব্যাক গ্রাউন্ডের কারণে কলেজে শিবিরের কর্মকাণ্ড জোরদার করার এজেন্ডা তার মাথায়। দশটার মিটিং-এও সে থাকতে চায় একই উদ্দেশ্যে।

-দশটার মিটিংটা

আমি শুধু ছাত্র নেতাদের নিয়ে করতে চাই।

-আমি থাকলে একটু হেল্প হতো।

কীরকম হেল্প সে তো জানাই আছে। সুরাইয়া ইরফানের দিকে তাকিয়ে বলে

-ভাববেন না আমি আছি।

-জ্বী ম্যাডাম জ্বী ম্যাডাম।

বলে বেরিয়ে যাবার পথে জলিলের হাতে রসগোল্লার প্লেট দেখে তার চক্ষু চক চক করে।

-আমি একখান লইলাম

বলে টপ করে মুখে পুরে দিয়ে কপাস কপাস শব্দ করে খেতে খেতে যাবার পথে সুরাইয়ার দিকে তাকিয়ে বলে, গোস্তাকী মাফ করবেন।

সুরাইয়া ডিসিকে ফোন করে। ডিসি মহোদয় দপ্তরে নেই। সার্কিট হাউজে সফররত মন্ত্রীর খেদমতে গেছেন। মন্ত্রীর খেদমতে এল আর ফান্ডের টাকা দিয়ে খাসি জবেহ দিতে হবে। মন্ত্রী তো শুধু একা নন। দশানন। তার সাঙ্গ পাঙ্গরা সার্কিট হাউজের পোলাও কোর্মা খাওয়ার জন্য ওঁৎ পেতে থাকে। এমনিতে ডিসিকে দেখলে স্যার বলে। কিন্তু মন্ত্রী আসলে পঙ্গপালের সাহস বেড়ে যায়। তখন মন্ত্রীর অনুকরণে ডিসি সাহেব বলে। অবশ্য ক্রুট মেজরিটির মন্ত্রীরা শুধু ডিসি ডিসি বলে হুঙ্কার দেয়। ফকিন্নীর ছেলে মন্ত্রী হয়েছে।

ডিসি ডিসি মিনারেল ওয়াটার কোথায়। ডিসি সাহেব টেবিল থেকে তুলে মেলে ধরে

-এইতো স্যার মিনারেল ওয়াটার

মন্ত্রী তখন পাবনার লোকায়ত স্যান্ডউইচ যার মধ্যে বাঁধাকপির তরকারিও থাকে। তাই খেতে খেতে দলীয় কর্মীদের ব্রিফিং দিচ্ছে।

বাঁধাকপির তরকারিতো কী হয়েছে অজ্ঞাতকুলশীল মন্ত্রী মহোদয়কে স্যান্ডউইচ খেতে হবে। চিবানোর সময় কলপ করা গোঁফে, ঠোঁটের দুপাশে বাঁধাকপি লেগে থাকে। আর ঠোঁটের নিচে কলসায় ঘা সেখানে ঝাল লাগে। চেঁচিয়ে ওঠেন মন্ত্রী মহোদয়

- ডিসি পানি কোথায়

ডিসি মনে মনে বলে

তোর তো দরকার সিংহ মার্কা

মলম। পানি দিয়া করবি কী।

সারাজীবন ডিসির মিনারেল ওয়াটারের বোতল খুলে দিয়েছে ইজ্জত, পরান, সোহরাব, মৃধা। ফলে বোতলের ছিপি কোন পাকে ঘোরালে খুলবে তা তার জানা নেই। সার্কিট হাউজের পিয়নগুলো আওয়ামী লীগ আমলের রিক্রুটমেন্ট বলে দরজার বাইরে রাখা হয়েছে। অগত্যা এনডিসি এসে বোতল খুলে দেয়। মিনারেল ওয়াটারের বোতল মন্ত্রী নিজ হাতে না খুললেও রাতে আসল বোতল নিজ হাতে খোলে। তখন পারে। এনডিসি মিনারেল ওয়াটারের বোতল খোলায় সিভিল প্রশাসনের মর্যাদা ধূল্যাবলুণ্ঠিত হলো। অবশ্য এর আর আছেই কী। সামনে দলীয় কর্মীরা দাঁত কেলিয়ে উপভোগ করলো এনডিসির অপমান। মন্ত্রী হাঁপানি সহ গলা খাকারী দেয় ডিসি পাকশী কলেজে কী হইছে শুনলাম।

-না বিশেষ কিছু নয়। ছাত্রলীগের

ছেলেদের হোস্টেল থেকে বার করে দিচ্ছে।

কারা দিয়েছে তা উহ্য থাকে। তা বলাই বাহুল্য। মন্ত্রী যেন শুনতেই পায়নি। খুলনার হাদিস পার্কে নিয়ে গিয়ে এর কান পারিষ্কার করে নিয়ে আসা দরকার।

- তা ডিসি আপনারা একটু

বাইরে যান। কিছু দলীয়

কথাবার্তা আছে।

ডিসি মনে মনে বলে আমি তো তোমাদের দলেরই লোক। মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক। আমি তো তোমাদের দলেরই লোক মামা। যাই হোক ভিআইপি রুমের বাইরে এসে এনডিসির কাঁধে থাবা দিয়ে বলে

- নেজারত ডিসি মান সম্মান বাঁচাইলা।

মিনারেলের বোতল খোলা এত কঠিন।

-স্যার আমরা এইটা পিএটিসি ট্রেনিং-এ শিখছি।

ডিসি মুচকি হাসেন।

নেজারত ডেপুটি কমিশনার ওরফে এনডিসি, স্যারের নরম মেজাজ দেখে কথাটা পাড়ে।

-সার আমার গাড়ির একটা চাকা বদলানো দরকার।

-এখন থিকা মাঠ প্রশাসনে আসবা

শ্বশুর বাড়ি থিকা চাক্কা যৌতুক নিয়া।

গাড়ি দিবো সরকার-চাকা দিবো

শ্বশুর। আর চাক্কায় হাওয়া দিবো

জনগণ।

ডিসি সাহেব খুব মজার লোক। শিক্ষিত ভদ্রলোক। জনপ্রশাসনের স্পয়েল সিস্টেমে পড়ে এরকম সাধারণ হয়ে গেছেন। তা না হলে একটা দুটো ভালো বই পড়ে গান শুনে তারও মনটা খারাপ হয়। ড্রাইভারের বাচ্চার জ্বর হলে তাকে ছুটি দিয়ে দেন। নিজে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফেরেন। একা একা ফিরতে ভালোই লাগে। তার মনে হয় বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের জীবন তো বাই চান্স অর্জিত একটা জীবন। দৈবচয়নে আমি হয়েছি ডিসি কেরামত হয়েছে ড্রাইভার। ভাগ্যের ফেরে আমি কেরামত হতে পারতাম। কেরামত আমি হতে পারতো। রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকিয়ে হাসেন। বিড় বিড় করে বলেন

কিরে কেরামত শইলডা বালা।

সার্কিট হাউজের ডাইনিং রুমের কাছে যেতেই খাজাঞ্চী দৌড়ে আসে। দৌড়ে আসে বাবুর্চি। ডিসি ইনস্ট্রাকশন দেয়

মাংসডা ভাল কইরা পাকাইবা

ভাতডা যেন ঝরঝইরা হয়।

ভেজিটেবলে তেল দিবা মিয়া

খালি পানি মাইরা ভ্যাসভ্যাইসা

কইরো না। মনে কয় যেন ঘাস

চিবাইতেছি।

মনে মনে বলেন গোরুদের জন্য ঘাস রান্না করাই অবশ্য উত্তম। আবার ফিরে আসেন সিদ্দীকা কবিরের ভূমিকায়

ডাইলে পাঁচ ফোড়ন দিবা।

পেঁয়াজে ভাইজা ভাল রকম

বাগাড় দিও।

সালাদ রাইখো বুঝছো।

খাজাঞ্চী দৈ কোথায়।

প্যারাডাইসের রসমালাই।

এনডিসি অবাক হয়ে লক্ষ্য করে লোকটার প্রতিভা। এর তো ডিসি না হয়ে হোম ইকনোমিকস কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হওয়া উচিৎ ছিল।

হঠাৎ পিওন দৌড়ে আসে।

ডিসির সামনে অদৃশ্য সাবানে হাত কচলায় আর আমতা আমতা করে।

ডিসি সাহেব ধমক দেয়

-ডরাও কেন কি হইছে?

-ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাডাম ফোনে

স্যার আপনার সাত কতা

কতি চায় স্যার।

-নো প্রবলেম।

সিঁড়ির কাছের ফোনটা তোলেন। সুরাইয়ার সাথে কথা বলতে গেলে মনটায় যেন ফুরফুরে একটা হাওয়া বয়ে যায়।

বদলে যায় মেজাজের রসায়ন।

-কী খবর সুরাইয়া কী সমস্যা

-স্যার কলেজে ছাত্র নেতাদের সাথে

মিটিং। কিন্তু বড় নেতারাও আসতে

চায় মিটিং-এ। তাদের জন্য ওয়েট

করছি। প্রিন্সিপ্যালের রুমে।
-এই তো গোলমাল। ফান্ডাটা
বড় হইয়া গেল। ওদিকে শহরে
মন্ত্রী স্বয়ং নিজে উপস্থিত।
দেইখো উল্টা পাল্টা কিছু হইলে
কিন্তু আমারো চাকরী নট তোমারো
চাকরি নট। আন্ডারস্টুড।
-জ্বি স্যার।
আর সাজিদ কেমন আছে!
তার শখের চাকরি কেমন চলতেছে।
একদিন একটু আসতে কইও।
কই দেহি দ্যাও ওরে।
-স্লামালে কুম।
-হ্যাঁ মিয়া ভুইলা গ্যালা নাকি।
-আপনি ব্যস্ত মানুষ।
-আরে তোমার জন্য কোনো ব্যস্ততা নাই
একটা ফোন দিয়া চইলা আসবা।
আমি গাড়ি পাঠামু।
রিক্সায় তো আর পাবনা আসা যায় না।
-আপনিও রিক্সার জোকটা জেনে গেছেন।
-রনী বলছে তোমরা নতুন নাম
নাকি অপু। থাউক গিয়া ঘাড়ের
ওপর মন্ত্রী পরে কথা হবে
বেস্ট অব লাক। মিটিং এর সময়
মেজাজ কনট্রোলে রাখবা। ওকে।
আল্লাহ হাফেজ।

প্রিন্সিপ্যালের রুমে প্রথম এলেন জামাতী নেতা সবুর মিয়া। পান খেতে খেতে। ধোপ দুরস্ত আলখাল্লা পরে। নূরানী চেহারা। তার পিতৃকূল খান এ সবুর খান এর বিশেষ ভক্ত হওয়ায়

নামখানাও হয়েছে জব্বর। এই লোকটাকে সাজিদ ছোটবেলায় দেখেছে ঈশ্বরদী কলেজ পাড়ায়। রিক্সা চালাত। ভাঙা মিহি কণ্ঠস্বর। সাজিদের মাকে চাচী আম্মা বলে ডাকতো। রিক্সা চালালে যা হয় দিন এনে দিন খাওয়া। হঠাৎ একদিন বিকাল বেলা বাদ আছর একদল লোক পিপিলিকার মত সারি বেধে ভূতে গাড়ি থেকে মশুরিয়া পাড়ার মাটির পথ ধরে ঈশ্বরদী কলেজের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সাজিদদের বাড়ির গেট খুলে সারিবদ্ধ আলখাল্লা পরা পিঁপড়েরা ঢুকে পড়লো কোনোরকম অনুমতি ছাড়াই।

বাবা তার রিডিং রুম থেকে বেরিয়ে আসতেই তাদের নেতা বাবার হাত ধরে টেপাটেপি শুরু করলেন। এই ধরনের সমকামী আচরণ বাবার ভীষণ অপছন্দ। নেতা পরিচয় করিয়ে দিলেন দু'তিনজন আলেমের সঙ্গে যারা ভারতের দেওবন্দ এমনকি পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে এসেছেন। একজন অধ্যাপকের গৃহে প্রবেশের জন্য এই বাড়তি ভার আরোপ অর্থাৎ দেখুন আমরা কেবল অত্র এলাকার ছোটখাটো মানুষ নই আমাদের সঙ্গে কাহারা একটু চোখ মেলে দেখুন।

বিদেশীরা ভাঙা ভাঙা ইংরেজি আর উর্দুতে কথা বলছিল। এই দেওবন্দী স্কুলিং এর ব্যাপারে বাবার আগে থেকেই আপত্তি ছিল। বাষট্টি তেষট্টি সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে হিন্দু বিদ্বেষ তার মধ্যেও কম কিছু ছিল না। দাঙ্গার সময় অসিত নামে এক ক্লাসমেট দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং এর তিনতলায় দাঁড়িয়ে বলেছিল, এখন যদি তোমাকে নিচে ফেলে দিই তোমাকে বাঁচানোর কেউ নেই। কিন্তু তবুও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাকে আকৃষ্ট করেছে। আলীগড়ের প্রতি আগ্রহ ছিল না তার। কারণ আলীগড় মুসলিম মুভমেন্টের স্পিরিট ষাটের দশক শুরুর আগেই ক্ষয়ে গেছে। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহের কারণে হিন্দুরা এগিয়ে গিয়েছিল। আর আরবী শিক্ষার প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ-ইংরেজি শিক্ষার প্রতি কট্টর ঘৃণা মুসলমানদের পিছিয়ে ফেলেছিল।

তাই বাবা মনে করতেন আশি-একাশি সালে এসে নতুন করে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি ঝুঁকে পড়ার অর্থ আবার পিছিয়ে পড়া।

আলোচনা শোনার জন্য অভ্যাগতরা সাজিদের বাবাকে পাশের মসজিদে আমন্ত্রণ জানালেন। বলা বাহুল্য নামাজ পড়ার সুবিধার জন্য বাবা তার সামান্য উপার্জন থেকে দুচারটে ফ্যান উপহার দিয়েছিলেন মুসল্লীদের জন্য। যে লোকের মুসলিম দর্শন এফোঁড় ওফোঁড় করে পড়া সে কেন যাবে এই অর্ধশিক্ষিতদের গাস্ত শুনতে। মসজিদে কিছুদিন নিয়মিত নামাজ পড়তে যেতেন বাবা। সেসময় মসজিদের ইমাম দেওবন্দী হওয়া সত্ত্বেও আশ্চর্যজনকভাবে আধুনিক এবং অসাম্প্রদায়িক, তিনি নামাজের পর বাবাকে অনুরোধ করতেন মুনাজাত পরিচালনার জন্য। বাবা বাংলায় প্রার্থনা করতেন। সে প্রার্থনার সুর পৌঁছে যেন মুটেমজুর, বিক্সাঅলা, মাছের ব্যবসায়ী, ছোট্ট কৃষকের মনের মধ্যে। তাদের চোখ এক অপূর্ব দীপ্তিতে ভরে উঠতো। পরে ভূইফোঁড় মৌলবাদীরা মসজিদটিকে দখল করে নেয়। নামাজের চেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল স্যুডো ধর্ম আলোচনায় তাদের আগ্রহ বেশি।

ফলে বাবা মসজিদে যাবার আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন। প্রগতিপন্থী ইমাম সাহেবও কোণঠাসা হয়ে পড়লেন। বাবা মসজিদে যান না বলে মাঝে মধ্যে বাসায় এসে তিনি বাবার সঙ্গে ধর্ম আলোচনা করতেন। অভ্যাগত মুসল্লী দলটি মিনিট পাঁচেকের বাহাসে নক আউট হয়ে মনে মনে বাবাকে কাফের বলে গালি দিয়ে চলে গেল। সেই মৌলবাদী দলটির পেছনে লজ্জা ও সংকোচবশত প্রায় লুকিয়ে ছিল রিক্সাচালক সবুর মিয়া। পাছে দোতলার জানালা দিয়ে চাচী আম্মা দেখে ফেলেন তাকে। সবুর মিয়া শুধু একদিন চুপিসারে এসে সাজিদের মাকে বলেছিল,

চাচী আম্মা সার নামাজ পড়ে না।

আমারে মওলানারা বুলিছে

মরি গেলে সারের জানাজায়

লোক হবি না। জানাজা পড়তি

কাফ্‌ফারা লাগবি।

পরে বাবা শুনে বলেছিলেন

আমার জানাজা নিয়ে ওদের

ভাবতে বোলো না।

আমি মরে গেলে ছাত্রদের ঢল নামবে।

পঁচিশ বছরে কম ছাত্রকে তো পড়াইনি।

সবুর মিয়া রিক্সা ফেলে, সংসার ফেলে তিরিশ চল্লিশ দিনের চিল্লা দিতে চলে যেত। তার বউ পাঁচ-ছটা বাচ্চা নিয়ে অকূল পাথারে। মাকে এসে সবুর মিয়ার বউ কাঁদতে কাঁদতে বলতো

চাচী আম্মা ছেলি মি লিয়ে

তিন চারদিন না খায়ি আছি।

মা ফ্রিজ থেকে যা আছে বের করে দিয়ে বলতেন

এ কেমন ধর্ম

বৌ বাচ্চা না খেয়ে আছে

আর সবুর গিয়ে বসে

আছে কাকরাইল মসজিদে।

সেই সবুরের অজ্ঞাত কারণে চেকনাই হলো। মশুরিয়া পাড়া গ্রামে হঠাৎ বড় সাদা দালান হলো। ধান খোলা হলো। বদলে গেল সবুরের জীবন। হয়তো আল্লাই দিয়েছেন এসব। কিংবা অন্য কেউ অন্য কোনো উদ্দেশ্যে। যে কারণে এখন বাংলাদেশে প্রতিদিন বোমা

ফুটছে। আত্মঘাতী বোমা হামলা হচ্ছে।

ছোটবেলা থেকে পরিচয় যার জন্য সবুর সাজিদকে তুমিই বলে

- কেমন আছাও সাজিদ।

-ভালো। আপনি ভালো।

-আল্লাহ যেমুন রাখছে।

সবুরের কথা বার্তায় বেশ কেতা হয়েছে। কে বলবে এই সবুর রিক্সা চালাতো। পড়া লেখা কিছুই জানে না। তবে রিক্সাচালক সবুরের মুখটা ছিল নিষ্পাপ। একটা নির্দোষ আলো-সৎ শ্রমের ঘামে খাওয়া অল্পভাতের মৌলিক পেশী ছিল তার।

আর এখন সেখানে একটা জটিল জ্যামিতি। খেলাফতী তাকত। দেশে শরীয়াহ আইন প্রচলনের অভীপ্সা। সুরাইয়ার দিকে চোরা চোখে এমন করে তাকায় মনের মধ্যে লোভের কিলবিলে সাপ আর রাজনৈতিক দর্শনে হিজাব দিয়ে তার মুখাবয়ব ঢেকে দেবার সংকল্প। এরপর এলেন বিএনপির নেতা সাত্তার মিয়া। জিয়াউর রহমানের সাফারী আর সানগ্লাস। সুদর্শন জিয়ার কুদর্শন অনুসারীটি বোধ হয় আশা করছিল যে প্রিন্সিপ্যাল এবং ম্যাজিস্ট্রেট তাকে সালাম দেবে। পার্টি ইন পাওয়ার বলে কথা।

- কেমন আছেন আপনারা।

এর অর্থ যেমন রেখেছেন আমাদের। এলাকার ছেলে বলে বাড়তি সুবিধা

- সাজিদ কেমন আছো মামা।

বুলবুল মামার বন্ধু হবার সুবাদে ভাগ্নে ক্যাটাগরিতে পড়ে গেলো সাজিদ।

- ভালোই চলছে। কিন্তু আজ

একটু খারাপ আছি।

সাত্তার মিয়া হাসে। সবুর মিয়ার দিকে ইনগ্রুপ হাসি দিয়ে বলে

-ভাগিনা খারাপ থাকলি

মামার তো কিছু করতি হয়

কী বুলেন মওলানা সাহেব।

সবুর মিয়া দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর জলসায় যেরকম মাথা নাড়ে সেরকম সমঝদার ভঙ্গীতে মাথা নাড়ে।

আবদুস সাত্তারের ঠিকুজি না দিলেই নয়। বাপ রেলের লাইন ম্যান ছিল। রিটায়ার মেন্টের পর গোরখোদক হয়েছিল। রিটায়ারমেন্ট মানে আর্লি রিটায়ারমেন্ট। জিয়াউর রহমনের

মার্শালয়ের সময় একজন আর্মি অফিসার ঈশ্বরদী রেলস্টেশনে নেমে দেখলেন প্লাটফর্মে নোংরা ইতস্তত পড়ে আছে। স্টেশন মাস্টারকে ডেকে ধমকে বললেন-

স্টেশন মাস্টার, আইয়ুব খানের

আমলে প্লাটফর্ম যেমন নিট অ্যান্ড ক্লিন

থাকতো উই ওয়ান্ট দ্যাট, গট ইট।

স্টেশন মাস্টার মাথা নাড়ে। আর্মি অফিসার ওয়াকিটকিতে কথা বলার ভঙ্গীতে বলে-

ওভার,

এই সময় লাইনম্যান গফুর সন্নিকটে ছিল। সে এসে উপযাচক হয়ে বলে-

-এত মানুষ আসে সার

নুংরা করি ফেলায়।

সাফ সুতরো রাখা কঠিন।

আর্মি অফিসারের চড়ে গফুর অজ্ঞান হয়ে যায়। লাল জামা পরা রেলের কুলিরা তাকে ধরাধরি করে সেকেন্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমে নিয়ে যায়।

-স্যাক হিম

-ইয়েস সার।

অবশ্য পরে বরখাস্ত না করে অবসর ভাতাসহ সোনালী করমর্দন করা হয়। সাত্তার মিয়া তখন যুবক। বাপের এই অপমানে হিন্দী ছবির ধর্মেন্দ্রর মত এক কসম খেয়ে বসে। এরি মাঝে ঈশ্বরদী লোকোশেডের তেল চুরি করে বিক্রি, টুকটাক শাড়ি চোরাচালানের মাধ্যমে সাত্তার ছোটখাটো ডন হয়ে উঠেছে।

লোকোশেডের বিহারী বসতিতে বড় হওয়ার কারণে নেহারী আর বাংলামদ খেয়ে দমা দম মাস্ত কলন্দর শোনার অভ্যাস হয় নিয়মিত। এখনকার নূর বাজার একদা পতিতা পল্লীতে বাধা মেয়ে মানুষ হয়। জুয়ার আড্ডায় দুচারটা খুন খারাবি করে পুলিশের খাতায় নাম উঠে যায়। পড়ালেখায় ম্যাট্রিকটাও শেষ হয়নি। রেলওয়ে নাজিমুদ্দীন স্কুলের একজন কাংসড বিনিন্দিতকণ্ঠ গণিত শিক্ষক তৈমুর লঙকে চপেটাঘাতের অপরাধে সাত্তার মিয়ার শিক্ষাজীবনের ইতি ঘটে। যে কারণে যুবদলে ঠাঁই হয়ে সাত্তার মিয়ার। ঈশ্বরদীর মাটি আওয়ামী লীগের ঘাঁটি হওয়ায় মোটরস্ট্যান্ডে লীগের ষন্ডারা সাত্তারের পেটে স্ট্যাব করে ভূঁড়ি ফাঁসিয়ে দেয়। অমনি নেতা বনে যায় সাত্তার। কৈ মাছের প্রাণ তার ওপর বাংলা মদজনিত মেদের আস্তর থাকার কারণে চাকু তলপেট অব্দি পৌছাতে পারেনি। পতিতাপল্লীতে শোকের মাতম ওঠে। জনৈকা বিহারী সুন্দরী বারনারী অন্ন এবং রোটি গ্রহণ ছেড়ে দেয়।

মেরি জানকো ওয়াপস দো

সে যাত্রা বেঁচে যায় সাত্তার। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় পুলিশের ধাওয়া খেয়ে

আশ্রয় নেয় বিহারী নারীর চৌকির তলায়। মানুষ হতাশায় থাকলে যা হয়। নফস কে দমন করতে পারে না। রিপুর তাড়না প্রবল হয়। ঈশ্বরদী কলেজের এক সুন্দরী মেয়েকে একটা কনস্ট্রাকশন সাইটে নিয়ে গিয়ে জোশের মাথায় ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারে সাত্তার। ঘটনাটা বড় হয়ে গেল। পুলিশ মরিয়া হয়ে উঠলো তাকে ধরার জন্য।

পাতিবিলের মদের ভাটিতে মদ খেয়ে চুর অবস্থায় ধরা পড়ে গেল সাত্তার। বলা বাহুল্য পাতিবিলের মদের ভাটি পুলিশ স্টেশন থেকে মাত্র ৪০০ গজ দূরে। আরো মজার ব্যাপার প্লাজা সিনেমা হলে অঞ্জু ঘোষের চাকভূম চাকভূম চাঁদবদনী দেখে থানার পাশ দিয়ে পাতিবিলের দিকে রিক্সা করে যাবার সময় পুলিশের এক হাওলাদার রত্নটিকে চিনে ফেলে। পুলিশ সময় দেয় পেটে মদ পড়ার। কারণ সুস্থ মস্তিষ্কে সাত্তার কখনোই ধরা পড়তে পারে না। ঐ দিক থেকে টপ টেররা গিফটেড। ঘণ্টা দুয়েক পরে মদের ভাটি ঘিরে ফেলে পুলিশ। চুয়ানী তখন সাত্তারের পাকস্থলীতে সাম্বা নৃত্য করছে। দুজন সেন্ট্রি কোলে করে থানায় নিয়ে এসে গরাদে পুরে ফেলে। আদুরে ছেলেটির ঘুম ভাঙলে তাকে পাবনা জেলে চালান করে দেয়।

যুবদলের মিছিল চলে,

তোমার ভাই আমার ভাই

সাত্তার ভাই সাত্তার ভাই

জেলের তালা ভাঙবো

সাত্তার ভাইকে আনবো।

ব্যাস সাত্তার বড় নেতা হয়ে গেল। একানব্বুই এ বিএনপি ক্ষমতায় এসে ফুলের মালা দিয়ে সোনার ছেলেকে সোনার ঘরে ফিরিয়ে আনলো। ঈশ্বরদী মোটরস্ট্যান্ডে এই ত্যাগী নেতার সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হলো। মেহনতী মানুষের প্রাণের নেতা, এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রসৈনিক, জেল জুলুমের শিকার আপোসহীন কণ্ঠস্বর সাত্তার ভাইয়ের গলায় মালা পরাতে পরাতে সারা মুখ ফুলে ফুলে ঢেকে গেল।

ফুলগুলো সরিয়ে নাও, আমার লাগছে। অবশ্য মালার মধ্যে চকমকি জরির মালাও ছিল। কোরবানির গুরুর মতো দেখাচ্ছিল। পুড়িয়ে মারা ধর্ষিতা কলেজ পড়ুয়া মেয়েটির পিতা ধূসর চোখে একজন দেশপ্রেমিকের সংবর্ধনা দেখে নীরবে বাড়ি ফিরে গেলেন। সবশেষে এলেন আওয়ামী নেতা। মুজিব কোট পরে। চুল বঙ্গবন্ধুর মতো উল্টো করে আঁচড়ানো। বয়োবৃদ্ধ। জরদগর। দেখতে বুড়ো পেঙ্গুইনের মতো। আওয়ামী লীগে তারুণ্যের অভাব তা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে মুক্তিযোদ্ধা মফিজ মিয়াকে দেখলে। তাকে দেখে সাত্তার এবং সবুর ছাদের কড়ি কাঠে মাকড়সার জালবোনা দেখতে এক একজন রবার্ট ব্রুস হয়ে ওঠে। গলা খাকারী দিয়ে মফিজ মিয়া বলতে থাকে

-ছাত্রদলের আর শিবিরের গুণ্ডারা

ছাত্রলীগকে কিভাবে কোণঠাসা

করিচে। (বঙ্গবন্ধুর মতো আঙ্গুল তুলে)
তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়া হোবে।

সুরাইয়া মৃদুভাবে বলে-

-মিটিং শুরু হলে তখন
যা বলার বলবেন।

-সংসদে কথা বুলতে দিবে না,
সংসদীয় কমিটি কথা বুলতে
দিবে না। রাজপথে এর জবাব দিবো।

জলিলকে পাঠানো হয় বাচ্চুমিয়া আর আলবেরুনীকে খবর দিতে। ইসমাইলকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ভাইস প্রিন্সিপালের নির্মীয়মাণ কক্ষে।

এই বৃদ্ধ মফিজ মিয়াকে দেখে বোঝার উপায় নাই যুদ্ধের পর রক্ষীবাহিনীর সদস্য হয়ে কী দাপট দেখিয়েছে। একটা ছাদ খোলা জীপে এলএমজি উঁচিয়ে ঘুরতো। কম্বল চুরির মাধ্যমে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের স্বপ্নের লিপিকার এই মফিজ মিয়ারা। রূপপুরে প্রকাশ্যে দুই জাসদ কর্মীকে ব্রাশফায়ার করে মাথা উড়িয়ে দিয়েছিল সোনার বাংলার সোনার ছেলে মফিজ। ঈশ্বরদী কলেজে আওয়ামী লীগের পান্ডারা বছরের পর বছর ছাত্র সংসদ নির্বাচন হতে দিতো না। একবার সাজিদের বাবাকে নির্বাচন কমিশনার করা হলো। আওয়ামী লীগের পান্ডারা ছাত্রদলের ছেলেদের কলেজের ধারেকাছে ভিড়তে দিতো না। সাজিদের বাবা নিজ দায়িত্বে তাদের নিয়ে এসে নিজের স্টাডি রুমে বসিয়ে ছাত্রদলের পুরো প্যানেলের মনোনয়নপত্র পূরণ করালেন। সেইবার কোনো প্রচারণা ছাড়াই ছাত্রদল অর্ধেকেরও বেশি পদ জিতে নিলো। মফিজ মিয়া বাড়ি বয়ে এসে সাজিদের বাবাকে অপমান করলো।

-প্রফেসার সাহেব আপনি বিএনপি
করেন। আপনি বিএনপির
এতগুলো সিট পাওয়ায় দিলেন।
কাজডা ভালো করলেন না।
সাজিদের বাবা ঋজু কণ্ঠে বলেছিলেন,
আমি বিএনপি ও না আওয়ামী লীগও
না। আমি একজন শিক্ষক।
আই থিংক মাই স্টুডেন্টস সুড
লার্ন এন্ড প্র্যাকটিস ডেমোক্রেসী
জাস্ট ফ্রম দিস পয়েন্ট।
চা খাবেন।

চা খেতে খেতে মফিজ মিয়া বলেছিল

-আপনে প্রপেসার। আপনার

সাত কথাত পারবুনিনি।

কিন্তু কাজডা ভালো হলি না।

ঐ দিন রাতে ছাত্রলীগের ছেলেরা সাজিদদের বাসার প্রাচীরে ককটেল মেরে গিয়েছিল। ডু ইউ নিড এনিথিং মোর অ্যাবাউট মফিজ মিয়া দ্য পেঙ্গুইন।

এই সব মিটিং এর সমস্যা হলো, যাই হোক তালগাছটা আমার। চেহারা গরম করে বসে মফিজ এবং রাইট ভাতৃদ্বয় সাত্তার-সবুর জোট সরকার। বাচ্চু মিয়া এবং আলবিরুনী যৌবন জ্বালায় ক্রোধে অগ্নি শর্মা। 'ভেড়া চোদা', এবং 'খানকির ছেলে' এই দুটি বিশেষণ বাচ্চু মিয়ার রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে ঋজু করছে। কারণে অকারণে ঐসব বিশেষণ প্রয়োগ করছে ছাত্রলীগের উদ্দেশ্যে।

সুরাইয়ার কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে। ভাইস প্রিন্সিপাল ফাররুখ সুহরোয়ার্দী ওরফে ফাসু গোটা গোটা হাতের লেখায় সভার মিনিউটস লিখছে। ইরফান পা ফাঁক করে বসে মিলাদের ভক্তি চোখে মুখে এনে সহিভাবে মাথা দোলাচ্ছে। ভেতরে কিসের জিকির চলছে কে জানে।

ফাসু এমাজউদ্দিনের ছাত্র। তাই বুদ্ধি করে ঈশ্বরদী পাল মিষ্টান্ন ভান্ডার থেকে ক্ষীরের সন্দেশ ওরফে প্যাঁড়া আনিয়ে রেখেছে। প্যাঁড়ার মধ্যে মিষ্টির কোনো অনামী কারিগরের আঙুলের চিহ্ন থাকে। মধুর ক্যান্টিনে এমাজউদ্দীন ছাত্রদল আর ছাত্রলীগকে পদ্মফুল সহযোগে মিষ্টি মুখ করিয়েছিলেন। এমন একটি মধুর ক্যান্টিনীয় ডিসকোর্স ফাসুর মাথায় খেলা করছে।

সাজিদ, বাচ্চু মিয়া এবং আলবেরুনীকে উদ্দেশ্য করে বলে-

ছাত্র সংসদের পুরো প্যানেল

জিতেছে ছাত্রলীগ, তার অর্থ

তাদের যথেষ্ট ছাত্র সমর্থন করেছে।

কলেজে থাকা এবং কলেজ হোস্টেলে

থাকা তাদের ডেমোক্রেটিক রাইট।

সাত্তার গর্জে ওঠে-

ভাগিনা তুমি কী আওয়ামী লীগ!

মফিজ মিয়া বিস্ফারিত চোখে তাকায়। এই সাজিদের বাবাকে সে একদা বলেছিল আপনি কী বিএনপি! বাচ্চু মিয়া বলে-

গত সরকারের আমলে

ছাত্রলীগ আমারে কলেজে

ঢুকতি দেয়নি। আপনে তখন

ছেলেন না সার। আমারে
কী ডেমোক্রিটিক রাইট ছেলো না।
আলবেরুনী মৃদু অনুযোগ করে-
তখুন এসমাইল মিছিলে
লিড দেতো-
একটা করে শিবির ধরো
সকাল বিকাল নাস্তা করো।
সাজিদ বোঝাতে চেষ্টা করে-
কোনো একটা জায়গায়
গিয়ে এসব বন্ধ করতে হবে।
আগে তোমরা ছাত্র, তারপর
ছাত্রনেতা। অতীতে যা হয়েছে
এখনো তোমরা যদি সেটাই
করো তাহলে তো চোখের বদলে
চোখ সেই আদিম ডকট্রিনে
ফিরে যেতে হবে।

বাচ্চু মিয়া, আল বেরুনীকে কিছুটা কনভিনসড দেখায়। কিন্তু সাত্তার-সবুর একগুঁয়ে।

-পাকশী কলেজে ছাত্রলীগের
আর কুনো জায়গা নাই।
মফিজ মিয়া গর্জে ওঠে

-জায়গা নাই মানে। জায়গা দিতে হবি। হয়ে গেলো। চিৎকার চেঁচামেচি। অকথ্য বিশেষণ বিনিময়। সেগুলো ফাসু কীভাবে লিখবে বুঝতে পারে না। ইরফান জলসার কায়দায় বেশ হোমো স্টাইলে নেতাদের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় টেপাটেপি করে তাদের শরীরে এক ধরনের যৌন সুড়সুড়ির মাধ্যমে সমঝোতার রসায়ন তৈরির চেষ্টা করে। ফাসু জলিল মিয়াকে চোখ টিপে প্যাঁড়া সন্দেশ নিয়ে আসতে বলে।

প্যাঁড়া খেতে খেতে সাত্তার মফিজকে টিপ্পনী কাটে।

-বিএনপি ক্ষমতায় তাও মফিজ ভাই
পাকশী কলেজে বসি প্যাঁড়া খাতিছেন।
আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল

একগ্লাস পানিও কেউ আমাদের দেয় নাই।

সবুর টিপ্পনী কাটে

-বলেন সুবাহান আল্লাহ।

মফিজ মিয়া লুকিয়ে লুকিয়ে হাসে।

মিষ্টি সন্দেশ খেয়ে ফেনসীবাদী বাচ্চু মিয়া এবং ফেনসী লীগ ইসমাইলের নেশাটা ধরে আসে। আলবেরুনী চক্ষু মুদে এমনভাবে সন্দেশ খায় যেন বেহেশতের মেওয়া খাচ্ছে। মনে শুধু একটাই ভয় কোন মালাউন কারিগর বানাইছে। লাইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ বলে সন্দেশকে নাপাক হইতে পাক করিয়া খায়।

ইরফান নোয়াখালীর আন্তরিকতা সহযোগে সুরাইয়াকে সন্দেশ পরিবেশন করে।

-অ্যান্না লন জি ম্যাডাম

বলে শুয়োরের মত ঘোঁত ঘোঁত করে হাসে।

হঠাৎ আছরের আজান পড়তেই সবুর, আলবেরুনী এবং ইরফান অস্থির হয়ে উঠলো। সবুর একটু তির্যক চোখে সুরাইয়ার দিকে তাকায়। মনে মনে বলে-

নালায়েক জেনানা। আজান পড়িতেছে

অথচ উহার মস্তক অনাবৃত।

সুরাইয়ার সিক্সথ সেন্স প্রবল। সে দ্রুত ওড়না মাথায় দেয়। অন্যদের জামাতে শরিক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ব্যর্থ হয় ইসলামের তিন ধ্বজাধারী। সময় আসিলে দেখিয়া লইব। মনে মনে কসম কাটিয়া তাহারা আল্লাহর রাহে জিকিরে ফিকিরে চলিলেন।

ফাসু এই ফাঁকে একটু বাক বাকুম বাক বাকুম করতে করতে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের দিকে গেল কবুতর ওরফে কবিরুনের সাথে কম্পিউটারের পিসি বিষয়ক ট্রাবল শুট করতে।

বাচ্চু মিয়া এবং ইসমাইল গেল পৃথকভাবে বিড়ি ফুঁকতে। সাত্তার মিয়া যাই কলেজটা ঘুরে দেখে আসি বলে লেডিজ কমনরুম সমীপে রওনা হলো। কোত্থেকে পলি বেগম ছুটে এসে ওড়না সরিয়ে দিয়ে ঘ্যাত ঘ্যাত জুড়ে দিলো সাত্তারের সাথে। এমন সময় রনির ফোন এলো

- কিরে অপু

আওয়ামী-বিএনপি-জামাত

কেমন যাচ্ছে পোঙ্গার মধ্যে।

-রনির ডাক্তার হওয়ার কারণেই

কী আজকাল ঐ বিশেষ প্রত্যঙ্গের

দিকে মনোযোগ।
-হ্যাঁ নিয়মিত পাইলস অপারেশন করছি
কি না।
-আজো ছিল নাকি কোনো।
-হ্যাঁ দুপুরে স্থানীয়
সংবাদদাতা মিজানের
পাইলস অপারেশন করলাম।
অদ্ভুত লোকরে। খালি মেয়েদের
মত কুঁ কুঁ করে।
-এখন রাখ ঐসব বাজে
আলাপ। সন্ধ্যায় দেখা হবে। বাই।
সুরাইয়া মিট মিট করে হাসছিল ।
-বন্ধুদের মধ্যে শুধু
ডার্টি জোকস বিনিময় নাকি।
-কী খুব ক্ষিদে পেয়েছে।
সিঙ্গাড়া আনাবো কলিজির সিঙ্গাড়া।
-খাইয়ে খাইয়ে আমাকে
আরো মোটা বানানোর চেষ্টা।

কয়েকবার বেল বাজিয়ে জলিলকে পাওয়া গেলো না। নামাজে গেছে। উঠে গিয়ে অন্য একজনকে পাওয়া গেলো। মাইকেল। ব্যাটা কাফের। তাকে দিয়েই সিঙ্গাড়া আনানো যাক। সিঙ্গাড়ার গন্ধ পেয়ে সাত্তার উপস্থিত। ডায়াবেটিস জনিত জটিলতা শেষ করে ফিরে এসেছে মফিজ। সংসদ আবার বসলো। শুধু চিৎকার করার কেউ নেই মাননীয় 'ড্যাপুটি স্পিকার'। সবুর এসে কমপ্লেন করলো।

-মসজিদে ইমামের পদ শূন্য।
জামাত করা বড় কঠিন।
সাজিদ ভাই ইমাম অ্যাপয়েনমেন্ট
দ্যাও। আমারে ক্যান্ডিডেট আছে।
সাজিদ বলে-
আমার পরিচিত দেওবন্দী ইমাম আছে।
যাকে ঈশ্বরদী কলেজ মসজিদ

থেকে আপনারা তাড়িয়েছেন।

ইরফান উপযাচক হয়ে বলে-

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের মনপছন্দ

ইমাম নিশ্চয়ই ভালোই হবেন।

সবুর তার অভিজ্ঞতা থেকে বলে,

লোকটা খুব জিদ্দি

সুরাইয়া হাসিমুখে বলে,

অনেক সময় ভালোমানুষেরও

জেদ থাকতে হয়।

বলেই সাজিদের দিকে তাকায়।

সাজিদ প্রসঙ্গে ফিরে আসে। সমঝোতার সবরকম চেষ্টা চলে। ইরফান হাঙরের মত কপ করে সিঙ্গাড়ায় কামড় দেয়। চপ চপ চকাস চকাস ভস ভস নানারকম ধ্বনাত্মক শব্দ তৈরি হয়।

-একটু পেঁয়াজ হলে জইমতো

এ জলিল যাবা একটু পেঁয়াজ

লই আই।

মুহুর্মুহু শব্দ করে ককটেল ফাটতে থাকে। কাটা রাইফেলের গুলির শব্দ। গগন বিদারী চিৎকার, মেয়েদের কান্নার রোল। জলিল দৌড়ে আসে।

গ্যাঞ্জাম বাধি গেছে

ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে ফিরিসে

ছাত্রদল ঠ্যাকাত চেষ্টা করতিছে।

সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা বই খাতা ফেলে ইতস্তত পালাচ্ছে। আকাশ ফাটানো শাসানির শব্দ। আহতদের আর্তচিৎকার। সাজিদ দৌড়ে বেরিয়ে যায়। ক্রস ফায়ারের মধ্যে দাঁড়িয়ে বোকার মত চিৎকার করে

আমি থাকতে এসব হতে
দেবো না। যদি মারামারি
করতেই হয় আমার লাশের

ওপর দাঁড়িয়ে করো।

সুরাইয়া উৎকণ্ঠিত হয়ে বাইরে যেতে চেষ্টা করে। ফাসু বাধা দেয়।

ম্যাডাম ওসব হুজ্জোতির

মধ্যে যাবেন না।

ফাসু প্রিন্সিপ্যাল কক্ষের সিটকিনিটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয়। তারপর কতিপয় রাজনীতিবিদ এবং বুদ্ধিজীবী নিরাপত্তার উষ্ণতায় সিঙ্গাড়া খেতে থাকে।

সুরাইয়া পুলিশকে ফোন করে।

সাজিদ ছাত্র ছাত্রীদের সব ক্লাস রুমের মধ্যে চলে যেতে বলে। দৌড়ে গিয়ে লেডিস কমনরুমের সামনে দাঁড়ায়। অর্থনীতির শিক্ষক নাসিম এসে বলে-

স্যার আপনি ভেতরে যান

আমি দেখতেছি।

কী এক সাহসে স্টাফ রুম থেকে সমস্ত শিক্ষকেরা বেরিয়ে এসে সাজিদের পাশে দাঁড়ায়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের এমন সাহস দেখে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। পুলিশের গাড়ী এসে থামে প্রিন্সিপ্যাল রুমের সামনে। দলীয় ক্যাডাররা ধেড়ে ইঁদুরের মত লছপছ করতে করতে যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়। যুদ্ধ থেমে গেছে। ক্যাথারসিস।

-ফাসুরা এখন বাইরে আসতে পারো।

ফাসুরা বেরিয়ে আসে। মফিজ মিয়া উপদেশ দেয়

-ইসবের মদ্দি যাবার তুমার কী

দরকার ছিল।

ফাসু মনে করে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব আননেসেসারী রিস্ক নিয়েছেন। এটা শিক্ষকের দায়িত্ব নয়। সুরাইয়া চুপচাপ পিলারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

সাত্তার রসিকতা করে-

-ভাগিনারতো জব্বর সাহস

রাজনীতি করবা নাকি। আমারে

ভাত মারতি চাও। হাওয়া ভবন

খবর পালি তো তুমাকই টিকিট দিবি।

আমি কিন্তু বলি দিচ্ছি

তুমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী প্রার্থী হবো।

সাজিদ হেসে বলে,

-একটু আগে না বললেন আমি

আওয়ামী লীগ!

সবুর আয়াতুল কুরসি পড়ে সাজিদের মাথায় ফুঁ দেয়।

-চাচী আম্মাক কবোনি

ছদকা দি দিতে।

আলবেরুনী, বাচ্চু মিয়া এবং ইসমাইলের চোখে অনুশোচনার আলো। মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের ঐ সমীহের ভঙ্গীটা নেতাদের কাছে ভালো ঠেকছে না। তারা দলীয় ক্যাডারদের মধ্যে দল ছাড়া অন্যকারো প্রতি আনুগত্য পছন্দ করে না। যে যার দলীয় ছাত্র নেতাকে নিয়ে চলে যায়। ফাসু আবার কবিরুনের কাছে যায় প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের সাহসের বিপরীতে প্রতিযুক্তি দাঁড় করাতে। সবসময় কাপুরুষদের কাছে যুক্তির চেয়ে প্রতিযুক্তি বেশি থাকে। পুলিশ ইনস্পেক্টরের ওয়াকিটকিতে পুলিশ সুপারের কণ্ঠ ভেসে আসে

-একটু সাজিদের সাথে কথা বলবো

ওভার।

পুলিশ ইনস্পেক্টর দৌড়ে আসে। ওয়াকিটাকি বাড়িয়ে দেয়।

-সাজিদ

-কিরে তুষার

-ঠিক আছিসতো।

-হ্যাঁ ঠিক না থাকার কী আছে।

-স্কুল-কলেজের মারপিটের

এক্সপেরিয়েন্স কাজে লাগছে

কী বলিস।

-মনে হচ্ছে।

-মনে আছে ভাঙড়ি মাছুমকে

সবাই মিলে কেমন মার দিয়েছিলাম।

-মনে থাকবে না।

শোন পরে কথা হবে।

কিছু ছাত্র ইনজিওরড। ফাস্ট এইড দিতে হবে।

-ঠিক আছে রাতে কথা হবে।

মোবাইলটা সাথে রাখিস বাপ।

ওভার।

দেশে ফেরার পর সব খারাপের মধ্যে এই একটা জিনিস মজা লাগছে সাজিদের। ছোট

বেলার বন্ধুরা ভালো ভালো দায়িত্বে আছে। অনেক কিছুই অনেক সহজ সাজিদের জন্য। কারণ জীবনে একটা জিনিস ও খুব আন্তরিকতার সঙ্গে করেছে সেটা হচ্ছে বন্ধুত্ব। ছোট বেলার বন্ধু তুষার পুলিশ হয়েছে। ভাবা যায় ঐ নম্র মিষ্টি ছেলেটা এখন পুলিশ। রাতে ওকে ঠোলা বলে চটিয়ে দেয়া যাবে। নাসিম বুদ্ধি করে রেলের হাসপাতালের ডাক্তার নিয়ে এসেছে। ছাত্রদের ছোটখাটো চোট। ইরফানও লেগে গেছে চিকিৎসায়। লোকটার কিছু কিছু ভালোগুণও আছে।

সুরাইয়া এগিয়ে আসে

-এবার যেতে হবে।

-চলুন গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিই।

-খুব সাহস দেখালেন।

সাজিদ স্বভাব সুলভ ফাজলামি মোডে চলে যায়।

-সাহস কোথায় দেখলেন

সস্তা হিন্দী ছবির আছর।

মুহাব্বতেঁ ছবির

অমিতাভ আর ম্যায় হুঁনার

শাহরুখ খান আমার অনুপ্রেরণার

উৎস। হিন্দী ছবি দেখেন না তো।

বলিউড জিন্দাবাদ।

ভুল বললাম সাত্তারের মতে

আমি তো আওয়ামী লীগ

বলিউড দীর্ঘজীবী হোক।

সুরাইয়া হাসে

এবার থামবেন।

শুরু হলো আপনার অসভ্যতা।

আমি ভেবে দেখেছি

এটাই আপনার জন্য মোক্ষম

গালি 'অসভ্য'।

সুরাইয়া গাড়িতে উঠে হাত নাড়ে। পেছন ফিরে একবার তাকায়। ম্যাজিস্ট্রেটের যেভাবে তাকানো সাজে না ঠিক সেইভাবে।